Department of Political Science

Indian Foreign Policy

SEM IV (Hons.)

CC 13

ANIRBAN DAS

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। 'পঞ্চায়েত' শব্দটির ব্যুৎপত্তি হিন্দি पंचायत থেকে। প্রাচীন ভারতে পাঁচজন সদস্য নিয়ে যে স্বশাসিত স্বনির্ভর গ্রামীণ পরিষদ গঠিত হত, তাকেই বলা হত পঞ্চায়েত। আধুনিককালে এই শব্দটির সঙ্গে যুক্ত হয় এক সমষ্টিগত চেতনা। 'পঞ্চায়েত' শব্দটির লোকপ্রচলিত অর্থ হয়ে দাঁড়ায় 'পাঁচ জনের জন্য'। সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাওয়ার পর বর্তমানে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের তৃতীয় স্তরের সরকার। বর্তমানে গ্রামবাংলাকে কেন্দ্র করে যে প্রশাসনিক, জনকল্যাণমূলক, বিচারবিভাগীয় ও প্রতিনিধিত্বমূলক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত, তাকেই পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নামে অভিহিত করা হয়। ১৮৭০ সালে প্রথম বঙ্গীয় গ্রাম চৌকিদারি আইনের মাধ্যমে আধুনিক গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। স্বাধীনতার পর গণতান্ত্রিক ভারতে এই ব্যবস্থা তৃণমূলস্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন আইন পাস হয় ও সংবিধান সংশোধন করা হয়। ১৯৫৭ সালে সর্বপ্রথম পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৯৫৭ ও ১৯৬৩ সালের আইন অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে চার-স্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়। এরপর ১৯৭৩ সালে নতুন আইনের মাধ্যমে চালু হয় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। ১৯৯১ সালে ভারতীয় সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনী অনুসারে পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং ১৯৯২ সালে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত আইনটিকেও পুনরায় সংশোধিত করা হয়।

ইতিহাস সম্পাদনা

প্রাচীন ভারতের গ্রামীণ শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল পাঁচজন নির্বাচিত বা মনোনীত ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান পঞ্চায়েত। এই প্রতিষ্ঠানের হাতে ন্যস্ত ছিল গ্রামগুলির প্রশাসন, আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ও বিচারব্যবস্থা পরিচালনের দায়িত্ব। মুঘল আমল পর্যন্ত ভারতের গ্রামগুলি এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাটি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের এই সুমহান ঐতিহ্যশালী শাসনব্যবস্থার সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। তার বদলে ভারতের রাজশক্তি নিজ কায়েমি স্বার্থ টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ভারতের গ্রাম ও নগরাঞ্চলে ব্রিটিশ ধাঁচের এক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। আধুনিক 'পঞ্চায়েতি রাজ' শাসনব্যবস্থা মহাত্মা গান্ধীর মস্তিষ্কপ্রসূত এক ধারণা। তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীন ভারতের আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠুক গ্রামকে কেন্দ্র করে। স্বাধীনতার পরে মূলত তার আদর্শ অনুসরণ করেই ভারতে গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। এর পরে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই ব্যবস্থাকে আধুনিক যুগের উপযোগী ও আরও বেশি কার্যকরী করে তোলার জন্য ভারতে ও পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন সরকারি পদক্ষেপ গৃহীত হয়। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বকালে (১৯৭৭-বর্তমান) পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হয়। মনে করা হয়ে থাকে, এই সরকারের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক সাফল্যের জন্য পঞ্চায়েত সংস্কার ও এই ব্যবস্থা থেকে প্রাপ্ত সুফলগুলি অনেকাংশে দায়ী। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ডক্টর অশোক মিত্রের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য, "...যদি পঞ্চায়েত ব্যর্থ হয়, সিপিআই(এম)-এর পরীক্ষানিরীক্ষাও ব্যর্থ হবে।"

ব্রিটিশ যুগসম্পাদনা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৫ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। এর ১০৫ বছর পর ১৮৭০ সালে বঙ্গীয় গ্রাম চৌকিদারি আইন বা বেঙ্গল ভিলেজ চৌকিদারি অ্যাক্ট পাস হয়। এই আইন অনুসারে গ্রামাঞ্চলের অপরাধ দমনের লক্ষ্যে বাংলার গ্রামাঞ্চলে

স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসাবে চৌকিদারি পঞ্চায়েত নামে একটি কৃত্রিম সংস্থা চালু হয়। জেলাশাসক এই সংস্থার সদস্যদের নিয়োগ করতেন আর গ্রামবাসীদের কাছ থেকে আদায় করা করে এর কাজকর্ম সম্পাদিত হত। বৃহত্তর গ্রামোন্নয়নের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ কোনও যোগাযোগ ছিল না।

লর্ড রিপন (দপ্তরকাল ১৮৮০-৮৪) প্রথম ভাইসরয় যিনি ভারতে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আগ্রহী হন। এই ব্যবস্থাকে 'রাজনৈতিক ও জনশিক্ষার হাতিয়ার' আখ্যা দিয়ে তিনি এর একটি বিস্তারিত রূপরেখা রচনা করেন। ১৮৮২ সালে এই ব্যাপারে রিপনের প্রস্তাব গৃহীতও হয়। ১৮৮৫ সালে ব্রিটিশ সরকার দেশে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপটি গ্রহণ করেন। পাস হয় বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন বা বেঙ্গল সেল্ফ-গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট। এই আইনবলে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের তিনটি সংস্থা কার্যকর হয় – গ্রাম স্তরে ইউনিয়ন কমিটি, মহকুমা স্তরে স্থানীয় পরিষদ এবং জেলা স্তরে জেলা বোর্ড।

এক বা একাধিক গ্রামের জন্য ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির হাতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিদ্যালয়, পুকুর ও রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত হয়। অর্থের জন্য এই কমিটিগুলি জেলাবোর্ডের উপর নির্ভরশীল থাকত ও বোর্ডের অধীনেই নিজের কাজ সম্পাদনা করত। এই ব্যবস্থার ফলে গ্রাম স্তরে দুটি প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে – চৌকিদারি পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন কমিটি।

মহকুমা স্তরে গঠিত স্থানীয় পরিষদেরও কোনও স্বতন্ত্র ক্ষমতা বা আয় ছিল না এবং এই সংস্থাও সর্ব ব্যাপারে জেলা বোর্ডের উপরেই নির্ভরশীল থাকত। জেলা বোর্ড এদের হাতে কোনও ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব অর্পণ করলে, তবেই তারা তা প্রয়োগ করতে সমর্থ হত। তাই বলা যেতে পারে এই পরিষদগুলি জেলা বোর্ডের কমিটি হিসাবেও কাজ করত। ১৯৩৬ সালে একটি আইন সংশোধনী বলে স্থানীয় পরিষদ বিলুপ্ত করা হয়।

প্রতিটি জেলায় একটি করে জেলা বোর্ড গঠিত হয়। বোর্ডের কার্যক্ষেত্র হয় জেলার সমগ্র গ্রামাঞ্চল। চার বছরের মেয়াদকালযুক্ত এই বোর্ডগুলি নয় থেকে ছত্রিশ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হত এবং এর সদস্যরা সকলেই নির্বাচিত হতেন। সদস্যদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি ও একজন সহসভাপতি নির্বাচিত হতেন। এই জেলা বোর্ডগুলির হাতে বহু দায়িত্ব ন্যস্ত থাকত। এদের প্রধান কাজ ছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যাতায়াত ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ। জেলা বোর্ডগুলির আয়ের উৎসও ছিল বিভিন্ন। আয়ের প্রধান উৎস ছিল পথ, সেতু, খেয়াঘাট, ডাকবাংলো, খোঁয়াড় প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত কর। সরকারি অনুদানও বোর্ডগুলি পেত। এছাড়া সাধারণের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষমতাও তাদের দেওয়া হয়েছিল। স্বাধীনোত্তর কালে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রবর্তনের আগে অবধি এই বোর্ডগুলি কাজ করে গিয়েছে।

১৮৯৯ সালে লর্ড কার্জন ভারতের ভাইসরয় পদে অভিষিক্ত হলে তিনি শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ ঘটান। কার্জন ভারতবাসীর স্বাধিকারের তীব্র বিরোধী ছিলেন এবং ভারতবাসীকে তিনি আদৌ গণতন্ত্রের উপযুক্ত বলে মনে করতেন না; তা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মতো যত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই হোক না কেন। তার প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ রোধ করার জন্য লর্ড মর্লি ১৯০৭ সালে রাজকীয় বিকেন্দ্রীকরণ কমিশন বা রয়্যাল কমিশন অন ডিসেন্ট্রালাইজেশন গঠন করেন। ১৯০৯ সালে এই কমিশন তার প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনে চৌকিদারি ও অন্যান্য স্থানীয় কাজের দায়িত্ব একটি একক গ্রামীণ সংস্থার হাতে অর্পণ করার প্রস্তাব রাখা হয় এবং বলা হয় এক-একটি গ্রামকে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি করতে না পারলে এই শাসনব্যবস্থায় গ্রামবাসীদের আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না।

এরপর ১৯১৪ সালে তদনীন্তন বাংলা সরকার একটি জেলা প্রশাসন কমিটি বা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি সুপারিশ করেন গ্রামাঞ্চলে এমন এক শাসন কর্তৃপক্ষ গড়ে তুলতে যার মধ্যে একাধারে ইউনিয়ন কমিটি ও চৌকিদারি পঞ্চায়েতের কাজ করবে এবং একটি গ্রামীণ বিচারব্যবস্থাও তার অন্তর্ভুক্ত হবে। মূলত এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৯১৯ সালে পাস হয় বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন বা বেঙ্গল ভিলেজ সেল্ফ-গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট। এই আইনবলে চৌকিদারি পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন কমিটি অবলুপ্ত করা হয় এবং উভয়ের ক্ষমতা একাধিক গ্রাম নিয়ে গঠিত ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে ন্যস্ত

করা হয়। এই বোর্ডগুলি গ্রামবাসীদের প্রয়োজনে নিজ নিজ এলাকায় কর ধার্য করার ক্ষমতা রাখত। এছাড়া এই আইনের ছোটোখাটো দেওয়ানি মামলা বিচারের জন্য ইউনিয়ন কোর্ট ও ছোটোখাটো ফৌজদারি মামলা বিচারের জন্য ইউনিয়ন বেঞ্চও গঠন করা হয়। এই বিচারব্যবস্থার বিচারকগণও ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত হতেন।

তবে এইসব ইউনিয়ন ও জেলা বোর্ডের কাজকর্ম প্রাথমিক শিক্ষা, জল সরবরাহ, সড়ক ও সেতু নির্মাণ এবং জনস্বাস্থ্যরক্ষা মতো কাজেই সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থ ও কর্মীর অভাবে এগুলির দ্বারা গ্রামীণ জীবনের ন্যূনতম চাহিদাগুলি পূরণ করা সম্ভব হত না। যদিও গ্রামবাংলার জনসাধারণকে ভাবী গণতন্ত্রের পথে অনেকটাই শিক্ষিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল এগুলি।

স্বাধীনোত্তর কাল - 'প্রথম প্রজন্ম' (১৯৪৭-১৯৭৭)সম্পাদনা

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হয় ও দেশের সংবিধান রচনার প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু খসড়া সংবিধানে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি যথোচিত গুরুত্ব না পাওয়ায় গান্ধীজি মনোক্ষুণ্ণ হন। তিনি চেয়েছিলেন, ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা হবে গ্রামকেন্দ্রিক আর তাই গ্রাম ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করবে। বস্তুত, আধুনিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মূল ধারণাটি তিনিই প্রথম ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন। এরপর সংবিধানের ৪০ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়ঃ রাজ্য গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং পঞ্চায়েতগুলি যাতে স্বায়ত্তশাসনের ইউনিট হিসাবে কাজ করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাদের হাতে অর্পণ করবে। [৩] কিন্তু এখানে মনে রাখা দরকার, ভারতের সংবিধান প্রণেতাগণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে ভারতের প্রশাসনিক কাঠামোটি গড়ে তোলেননি। তাই পঞ্চায়েতের সাংবিধানিক স্বীকৃতি মিললেও এই ধারাটি নির্দেশমূলক নীতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এর বাস্তবায়নে রাজ্য বা কেন্দ্র কেউই বাধ্য ছিল না।

তবে এই নির্দেশ অনুসরণ করে ভারতের কোনও কোনও রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গেও পরীক্ষামূলকভাবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয় বারুইপুর, মহম্মদবাজার, সাঁইথিয়া, নলহাটি, শক্তিগড়, গুসকরা, ঝাড়গ্রাম ও ফুলিয়া ব্লক এলাকায়। পরীক্ষামূলক পঞ্চায়েতে কোনও আইনগত সংস্থা না থাকায় এগুলির কাজ চলতে থাকে ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনেই। গ্রামবাসীরা এক জায়গায় মিলিত হয়ে হাত তুলে ভোট দিয়ে সদস্য নির্বাচন করতেন ও কার্যালয়ের ব্যয় ও গ্রামোন্নয়ন বাবদ পঞ্চায়েতগুলিকে ১০০ টাকা করে দেওয়া হত। কাজ হত গ্রামবাসীদের দান আর কায়িক শ্রমে।

১৯৫৭ সালে প্রকাশিত বলবন্তরাই মেহতা কমিটির সুপারিশক্রমে ভারতের সব রাজ্যেই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়। তবে পশ্চিমবঙ্গে ১৯১৯ সাল থেকে প্রচলিত ইউনিয়ন বোর্ডকে বাদ দিয়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করা সম্ভবপর ছিল না। সেই কারণে এ রাজ্যে চার-স্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়। ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন বা ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত অ্যাক্টের মাধ্যমে চালু হয় দ্বিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় গ্রাম স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুরনো ইউনিয়ন বোর্ড স্তরে অঞ্চল পঞ্চায়েত গঠিত হয়। ১৯৫৮ সালে এই আইন অনুসারে প্রথম নির্বাচন হয়। এরপর ১৯৬৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিষদ আইন বা ওয়েস্ট বেঙ্গল জিলা পরিষদ অ্যাক্টের মাধ্যমে ১৯৬৪ সালে ব্লক স্তরে আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা স্তরে জেলা পরিষদ গঠিত হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামোন্নয়নে স্থানীয় নির্বাচিত সংস্থাকে যুক্ত করা এবং উন্নয়ন ও পরিকল্পনার কাজে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা। এইভাবে গড়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গের চার-স্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থাঃ

- চার-স্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা –
    - গ্রাম পঞ্চায়েত – এক বা একাধিক গ্রাম নিয়ে গঠিত হত গ্রাম পঞ্চায়েত। প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা ছিল ৯ থেকে ১৫। এঁরা সকলেই এলাকার ভোটদাতাদের দ্বারা চার বছরের জন্য নিযুক্ত হতেন। নির্বাচিত সদস্যবর্গ নিজেদের মধ্যে থেকে একজন অধ্যক্ষ ও একজন উপাধ্যক্ষকে নির্বাচন করতেন। সরকার মনোনীত সদস্যরা অবশ্য এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারতেন না। অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের দপ্তরের মেয়াদ ছিল চার বছর। গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের গৃহীত প্রস্তাববলে এঁদের অপসারিত করা যেত। অধ্যক্ষই ছিলেন পঞ্চায়েতের মুখ্য কার্যনির্বাহী।

পঞ্চায়েতের কাজকর্মের সকল দিকেই তাকে নজর রাখতে হত। এছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় তাকেই সভাপতিত্ব করতে হত।

গ্রাম পঞ্চায়েত এক্তিয়ারভুক্ত এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে গ্রাম সভা গঠিত হত। গ্রাম সভার বৈঠক বসত বছরে দু-বার। অধ্যক্ষ এই বৈঠকগুলিতে সভাপতিত্ব করতেন। সাধারণ বাৎসরিক বৈঠকে পরবর্তী বছরের ব্যয়বরাদ্দ ও পূর্ববর্তী বছরের কাজের প্রতিবেদন বিবেচনা করা হত। গ্রাম সভা গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা ভোগ করত, কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না।

গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা ও কার্যাবলি ছিল তিন ধরনের – বাধ্যতামূলক, অর্পিত ও ঐচ্ছিক। মূলত পৌর দায়িত্বসংক্রান্ত কাজগুলি ছিল বাধ্যতামূলক কাজ ও উন্নয়ন ও পল্লি পুনর্গঠন সংক্রান্ত কাজগুলি অর্পিত ও স্বেচ্ছাধীন ও অর্পিত কাজের মধ্যে পড়ত।

তবে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয়ের কোনও উৎস ছিল না। এই ব্যাপারে তাদের নির্ভর করতে হত অঞ্চল পঞ্চায়েতের অনুদানের উপর। এছাড়াও নিজস্ব কোনও কর্মচারীও এদের ছিল না। অধ্যক্ষকেই সব দায়দায়িত্ব বহন করতে হত।

- অঞ্চল পঞ্চায়েত – অঞ্চল পঞ্চায়েত গঠিত হত কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা নিয়ে। মূল আইনবলে এই পঞ্চায়েতের সদস্যগণ গ্রাম সভা কর্তৃক নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হত। পরবর্তীকালে দুই প্রকার সদস্য নিয়ে অঞ্চল পঞ্চায়েত গঠিত হতে থাকে – (১) অঞ্চল পঞ্চায়েতের অধীন গ্রাম পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষগণ ও (২) গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা থেকে নির্বাচিত সদস্যগণ। অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলি প্রথম বৈঠকে একজন প্রধান ও একজন উপপ্রধান নির্বাচিত করে নিত। অঞ্চল পঞ্চায়েত, প্রধান ও উপপ্রধানের দপ্তরের মেয়াদকাল ছিল চার বছর। এছাড়াও অঞ্চল পঞ্চায়েতে একজন সচিব থাকতেন; যিনি প্রধানকে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন ও সহায়তা করতেন। আর থাকতেন কয়েকজন চৌকিদার ও দফাদার।

  অঞ্চল পঞ্চায়েত মূলত এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিল। এজন্য দফাদার ও চৌকিদারকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অঞ্চল পঞ্চায়েতের হাতেই অর্পণ করা হয়েছিল। এছাড়াও ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন, কর ধার্য ও সংগ্রহ করাও অঞ্চল পঞ্চায়েতের অন্যতম কাজ ছিল।

  অঞ্চল পঞ্চায়েতের আয়ের মূল উৎস ছিল কর, অভিকর ও মাশুল। এছাড়া এরা কিছু সরকারি অনুদানও পেত। তবে অঞ্চল পঞ্চায়েতের আয় এতই কম ছিল যে নিজেদের ব্যয় বহনের পর গ্রাম পঞ্চায়েতকে উন্নয়নকাজের অনুদান হিসাবে দেবার মতো খুব কম টাকাই তাদের হাতে থাকত।

- আঞ্চলিক পরিষদ – প্রত্যেকটি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক এলাকায় একটি করে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদে সরাসরি নির্বাচিত কোনও সদস্য ছিলেন না। পরোক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্য, পদাধিকার বলে সদস্য ও একজন সহযোগী সদস্য নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হত। স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বা ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার (বিডিও) হতেন সহযোগী সদস্য। অন্যান্যরা ছিলেন – (১) সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধানগণ (এঁরা পদাধিকার বলে সদস্য হতেন); (২) প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত অধ্যক্ষদের মধ্য থেকে নির্বাচিত একজন অধ্যক্ষ; (৩) এলাকা থেকে নির্বাচিত অথচ মন্ত্রী নন এমন সাংসদ ও বিধায়ক এবং এলাকায় বসবাস করেন অথচ মন্ত্রী নন এমন রাজ্যসভা ও বিধান পরিষদের সদস্য; (৪) রাজ্য সরকার মনোনীত দুজন মহিলা ও দুজন অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্য; (৫) আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত দুজন সমাজসেবী ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

  আঞ্চলিক পরিষদগুলিতে একজন সভাপতি ও একজন সহকারী সভাপতি পরিষদ সদস্যদের দ্বারা চার বছরের জন্য নির্বাচিত হতেন। স্থানীয় বিডিও পদাধিকার বলে পরিষদের কার্যনির্বাহী আধিকারিকের কাজ করতেন। কয়েকটি স্থায়ী সমিতির মাধ্যমে পরিষদ তার কার্য সম্পাদনা করত।

  আঞ্চলিক পরিষদের প্রধান কাজগুলি ছিল প্রধানত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণমূলক। কিছু কৃষি, সমবায়, জল সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য ও অপরাপর কিছু জনকল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও অর্থ সাহায্যদানের ক্ষমতা পরিষদগুলিকে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলির বাজেট অনুমোদন করত আঞ্চলিক পরিষদগুলি।

  নিজস্ব আয়ের সূত্র থাকলেও কোনও আঞ্চলিক পরিষদই সেগুলি ব্যবহার করত না; ফলে এই পরিষদগুলি রাজ্য সরকার ও জেলা পরিষদের অনুদানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।

- জেলা পরিষদ – পূর্বতন জেলা বোর্ড বাতিল করে গঠিত হয় জেলা পরিষদ। একমাত্র কোচবিহার জেলায় কোনও জেলা বোর্ড না থাকায় সেখানে নতুন করে জেলা পরিষদ গঠন করা হয়।

  এই জেলা পরিষদ সদস্য ও সহযোগী সদস্য নিয়ে চার বছরের জন্য গঠিত হত। সহযোগী সদস্যদের মধ্যে থাকতেন মহকুমা শাসক, জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক প্রমুখ সরকারি প্রশাসক ও কর্মচারী আর সদস্যদের মধ্যে থাকতেন – (১) আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতিগণ (এঁরা

পদাধিকার বলে সদস্য হতেন); (২) প্রত্যেক মহকুমা থেকে অধ্যক্ষদের দ্বারা নির্বাচিত দু-জন সদস্য; (৩) জেলায় বসবাসকারী অথবা জেলা থেকে নির্বাচিত অথচ মন্ত্রী নন এমন সাংসদ ও বিধায়ক; (৪) সরকার মনোনীত পুরসভা বা পৌরসংস্থার চেয়ারম্যান বা মেয়র; (৫) জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি এবং (৬) সরকার মনোনীত অনধিক দু-জন মহিলা।

জেলা পরিষদের প্রথম সভায় একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস-চেয়ারম্যানকে নির্বাচিত করা হত। চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত থাকত আর্থিক ও প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার দায়িত্ব। তবে পরিষদের নীতি ও প্রস্তাবগুলি রূপায়ণের দায়িত্ব অর্পিত ছিল একটি প্রশাসনিক যন্ত্রের উপর; যার শীর্ষে থাকতেন কার্যনির্বাহী আধিকারিক। এছাড়াও পরিষদের সচিবের দায়িত্ব সামলাতেন অপর একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক। এঁরা দুজনেই পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনিক কৃত্যক বা ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস (ডাবলিউবিসিএস)-এর সদস্য ছিলেন।

জেলা পরিষদের প্রধান কাজ ছিল উন্নয়নমূলক। অন্যান্য কাজের মধ্যে ছিল আঞ্চলিক পরিষদের বাজেট অনুমোদন এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সমন্বয় সাধন।

চার-স্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রামোন্নয়নের মূল দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে ন্যস্ত থাকলেও সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি দুর্বলই থেকে যায় এবং স্বভাবতই এদের কাজকর্ম অবহেলিত হতে থাকে। পূর্বতন ইউনিয়ন বোর্ডের যেসব কাজ ছিল অঞ্চল পঞ্চায়েতকে তার চেয়ে বেশি কাজ করতে হত না। বরং উন্নয়নমূলক কাজকর্মের হাত থেকে অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলি রেহাই পেয়েছিল। বাস্তব ক্ষেত্রে গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়েত চালাবার মতো দক্ষ কর্মীর অভাবে ভুগছিল বাংলার গ্রামাঞ্চল। তা সত্ত্বেও ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা চালু হয়ে যায় পশ্চিমবঙ্গে। সরকার এদের হাতে কিছু প্রকল্পও অর্জন করেন। কিন্তু ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে সেসব প্রকল্প প্রত্যাহার করে নেন। এদিকে প্রথম নির্বাচনের পর আর নির্বাচন না হওয়ায় পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিও নিষ্ক্রিয় ও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে পঞ্চায়েত সংক্রান্ত আইনদুটি প্রণীত হওয়ায় পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

এই কারণে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পুনর্গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালে পাস হয় পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন বা ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত অ্যাক্ট। এই আইনবলে চার-স্তর পঞ্চায়েতের পরিবর্তে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত প্রবর্তিত হয় – পূর্বতন অঞ্চল পঞ্চায়েত স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা স্তরে জেলা পরিষদ।

বামফ্রন্ট আমল - 'দ্বিতীয় প্রজন্ম' (১৯৭৭-বর্তমানকাল)সম্পাদনা

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ক্ষেত্রে বিপ্লব সূচিত হয়। ১৯৭৩ সালের পর থেকে বেশ কয়েকবার পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন সংশোধিত করা হয়। এই আইন অনুসারে ১৯৭৮ সালের জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গের নবগঠিত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতে এই প্রথমবার দলীয় প্রতীকের ভিত্তিতে একই দিনে পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনের ফলে ১৫টি জেলা পরিষদ, ৩২৪টি পঞ্চায়েত সমিতি ও ৩২৪২টি গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হয়। ১৯৮৮ সালে দার্জিলিং জেলার পার্বত্য মহকুমাগুলিতে দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল হওয়ায় ওই জেলার জেলা পরিষদ অবলুপ্ত হয়। তার পরিবর্তে শিলিগুড়ি মহকুমায় একটি মহকুমা পরিষদ গঠিত হয়, যা একটি স্বতন্ত্র জেলা পরিষদের ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করে। ১৯৭৮ সাল থেকে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নিয়ম করে পঞ্চায়েতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সর্বশেষ নির্বাচন হয়েছে ২০০৮ সালে। অধ্যাপক প্রভাত দত্ত পশ্চিমবঙ্গের এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে 'দ্বিতীয় প্রজন্মের পঞ্চায়েত' আখ্যা দিয়েছেন। এই পঞ্চায়েত সংস্কার ও নিয়মিত নির্বাচন ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ধারণাটিকে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় করে তোলে। এর ফলে ব্যাপক হারে জনসাধারণ সরকারি কাজে অংশগ্রহণের সুবিধা অর্জন করে। ফলে তাদের মধ্যে উৎসাহ ও সাহস অনেক বৃদ্ধি পায়। অধ্যাপক অমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের মূল্যায়নে, "সাধারণ গ্রামবাসীরা আর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে দাক্ষিণ্য প্রার্থনা করতে যান না, বরং যান যা তাঁদের প্রাপ্য তার দাবি নিয়ে। নয়া গণতন্ত্রে মানুষের রাজনৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি কম গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব নয়।"

গঠনসম্পাদনা

বর্তমান পঞ্চায়েত আইন অনুসারে ১৯৭৮ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু আছে, তার তিনটি স্তর হল – গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ। গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে গ্রাম স্তরে। এই 'গ্রাম' শব্দটি প্রচলিত গ্রামের ধারণার থেকে একটু আলাদা। সরকারিভাবে, গ্রাম বলতে বোঝায় কোনও মৌজা বা মৌজার অংশ অথবা পাশাপাশি অবস্থিত কয়েকটি মৌজা। সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা নির্ধারণ করে দেন। সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক স্তরে গঠিত হয় পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা স্তরে জেলা পরিষদ।

গ্রাম পঞ্চায়েত সম্পাদনা

গ্রাম পঞ্চায়েত পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তর। একটি গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করার জন্য রাজ্য সরকার কোনও একটি মৌজা, বা তার অংশবিশেষ, বা তার সংলগ্ন একাধিক মৌজা, বা তার অংশবিশেষকে 'গ্রাম' ঘোষণা করে থাকেন। প্রত্যেক গ্রামের নামে গ্রাম পঞ্চায়েতের নামকরণ হয়ে থাকে। ১৯৯২ সালের পঞ্চায়েত আইনের সংশোধনী অনুসারে পূর্বতন অঞ্চল পঞ্চায়েতের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকাকেই গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকা বলে ঘোষিত হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি প্রতি পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। এগুলি এক-একটি নিগমবদ্ধ সংস্থা বা কর্পোরেট বডি হিসাবে কাজ করে, যাদের একটি করে সাধারণ সিল থাকে এবং এরা মামলা করতে পারেন বা এদের বিরুদ্ধে মামলা করা যেতে পারে।

- সদস্য – গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হয় দু-ধরনের সদস্য নিয়ে – নির্বাচিত ও পদাধিকার বলে সদস্য। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যসংখ্যা ন্যূনতম পাঁচ ও সর্বাধিক ৩০। নির্বাচিত সদস্যগণ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার আইনসম্মত নির্বাচক বা ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হন। এছাড়া পদাধিকার বলে সদস্যদের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছেন অথচ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বা সহকারী সভাপতি নন এমন সদস্যগণ।

  নির্বাচনের সুবিধার জন্য প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাকে কয়েকটি নির্বাচনক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়েছে। সাধারণত প্রতি ৫০০ ভোটদাতা পিছু একজন সদস্য ও ৫০০-এর বেশি ভোটদাতা হলে অতিরিক্ত একজন সদস্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচিত হন। পার্বত্য এলাকায় অবশ্য প্রতি ১০০ ভোটদাতা পিছু একজন সদস্য ও ১০০-এর বেশি ভোটদাতা হলে একজন অতিরিক্ত সদস্য নির্বাচত হয়ে থাকেন।

  এছাড়াও ১৯৯২ সালের সংশোধনীতে বলা হয়েছে জনসংখ্যার অনুপাতে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে তফশিলি জাতি, উপজাতি ও মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে। তাছাড়া তফশিলি জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষিত আসনের ১/৩ ভাগ আসন তফশিলি জাতি ও উপজাতির মহিলাদের জন্য এবং সর্বমোট আসনের ১/৩ ভাগ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অসংরক্ষিত আসনগুলিতেও তফশিলি জাতি, উপজাতি ও মহিলারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

- প্রধান ও উপ-প্রধান – গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম সভায় সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে প্রধান ও একজনকে উপ-প্রধান নির্বাচিত করেন। এই ভোটাভুটি হয় গোপন ব্যালটে। এঁদের উভয়ের কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য এমন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যরা অবশ্য এই দুই পদের জন্য প্রার্থী হতে পারেন না।

  জেলায় অবস্থিত প্রধান ও উপ-প্রধানের পদগুলি তফশিলি জাতি, উপজাতি ও মহিলা জনসংখ্যার অনুপাতে সংরক্ষিত এবং সংরক্ষিত আসনের ২/৩ অংশ আবার ওই সম্প্রদায়গুলির মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। তাছাড়া সর্বমোট প্রধান ও উপ-প্রধান পদের ১/৩ অংশ আবার মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত।

  প্রধান বা উপ-প্রধান স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন অথবা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকাংশ সদস্য প্রস্তাব গ্রহণ করে তাদের অপসারিত করতে পারেন। রাজ্য সরকারও নির্দিষ্ট কারণে কোনও প্রধান বা উপ-প্রধানকে অপসারিত করার ক্ষমতা রাখেন। প্রধান বা উপ-প্রধান পদচ্যুত হলে, পদত্যাগ করলে বা মারা গেলে যদি ওই পদদুটি শূন্য হয়, তবে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে নতুন প্রধান বা উপ-প্রধান নির্বাচিত করেন; যিনি পূর্ববর্তী প্রধান বা উপ-প্রধানের অবশিষ্ট কার্যকাল পর্যন্ত দপ্তরে অধিষ্ঠিত থাকেন।

- সদস্যপদের অযোগ্যতা ও সীমাবদ্ধতা – কোনও ব্যক্তি একই সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের নির্বাচন প্রার্থী হতে পারেন না। সরকারি বা পঞ্চায়েতি সংস্থার কর্মচারী, পঞ্চায়েতের ঠিকাদারের কর্মচারী, দেউলিয়া, অপ্রকৃতিস্থ, পঞ্চায়েতের বকেয়া কর বাকি আছে যার এমন কেউ, একুশ বছর বয়স হয়নি এমন কেউ, দণ্ডপ্রাপ্ত প্রধান বা উপ-প্রধান, অডিটর প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করার কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত এবং রাজ্য সরকার দ্বারা অপসৃত পঞ্চায়েতের যেকোনও স্তরের চেয়ারপার্সন গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচনে দাঁড়াতে পারেন না। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হওয়ার পরে কোনও ব্যক্তিকে গ্রাম পঞ্চায়েত বা ভোটদাতারা অপসারিত করতে পারেন না। একমাত্র মহকুমা শাসকই এই কাজ করতে পারেন। তাছাড়া দলীয় ভিত্তিতে পঞ্চায়েতের নির্বাচন হয়ে থাকে বলে রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করলে সদস্যপদের অযোগ্যতা দেখা দিতে পারে। এছাড়াও কোনও ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের সভা – প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে মাসে একবার সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনজন সদস্য সাপেক্ষে মোট সদস্যসংখ্যার ১/৩ অংশ উপস্থিত থাকলেই সভা করা যায়। মুলতুবি বৈঠকের জন্য কোনও কোরামের প্রয়োজন হয় না। প্রধান বা তার অনুপস্থিতিতে উপ-প্রধান এই সভার সভাপতিত্ব করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভায় উত্থাপিত সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হয়। তবে সমসংখ্যক ভোট পড়লে সভাপতি দ্বিতীয় বা মীমাংসাসূচক ভোটদান করতে পারেন।

গ্রাম সংসদ সম্পাদনা

গ্রাম পঞ্চায়েতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে গ্রামবাংলার তৃণমূল স্তরে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যে দুটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হল গ্রাম সংসদ। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেক নির্বাচনক্ষেত্রে একটি করে গ্রাম সংসদ আছে। এই গ্রাম সংসদগুলি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ভোটারতালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত। সংসদের দুটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় – ষান্মাসিক ও বাৎসরিক। গ্রাম সংসদের সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান, উপ-প্রধান অথবা সংসদক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত সদস্যরা। সদস্যসংখ্যার ১/১০ অংশ উপস্থিত থাকলেই সভার কোরাম হয়। তবে মুলতুবি সভার জন্য কোরাম কোরামের প্রয়োজন পড়ে না।

- কাজ – গ্রাম সংসদের কাজ গ্রাম পঞ্চায়েতকে পরামর্শ দেওয়া ও গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজে সহায়তা করা। এলাকার মধ্যে আর্থিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার সংক্রান্ত গৃহীত বা প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলির সম্পর্কে গ্রাম সংসদ গ্রাম পঞ্চায়েতকে পরামর্শ দিয়ে থাকে। এছাড়া গ্রামের আর্থিক উন্নতির জন্য প্রকল্পের অগ্রাধিকারদান ও উপযুক্ত নীতিগ্রহণ, দারিদ্র-দূরীকরণ সংক্রান্ত প্রকল্পগুলির উপভোক্তা নির্ণয়, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির আয়ব্যয়ের হিসাব ও অডিটরের প্রতিবেদন আলোচনা, বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে অংশগ্রহণের জন্য গণসমাবেশের আয়োজন, এলাকায় সাম্প্রদায়িক ও গোষ্ঠীগত সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণ, প্রধান বা অন্যান্য পঞ্চায়েত সদস্যের কাজের বিরুদ্ধে আপত্তি থাকলে তা নথিভুক্তকরণও গ্রাম সংসদের কাজ।

গ্রাম সভা সম্পাদনা

গ্রাম পঞ্চায়েতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে গ্রামবাংলার তৃণমূল স্তরে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যে দুটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে, তার মধ্যে দ্বিতীয় সংগঠনটি হল গ্রাম সভা। সমগ্র গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জন্য একটি করে গ্রাম সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। পঞ্চায়েত এলাকায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ভোটার তালিকায় নাম আছে এমন সকলেই গ্রাম সভার সদস্য। গ্রাম সভার অধিবেশনও বছরে দু-বার অনুষ্ঠিত হয় – ষান্মাসিক ও বাৎসরিক। এই অধিবেশনের জন্য মোট সদস্যসংখ্যার ১/২০ অংশ উপস্থিত থাকা আবশ্যক। এখানেও মুলতুবি সভার জন্য কোরামের প্রয়োজন পড়ে না। গ্রাম সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বা উপ-প্রধান।

- কাজ – গ্রাম সভার কাজগুলি হল (১) গ্রাম সংসদগুলির প্রস্তাব বিবেচনা করা; (২) অধিবেশনে উত্থাপিত প্রশ্নগুলি আলোচনা করা ও সেগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে বিবেচনার জন্য প্রেরণ; (৩) এলাকায় গৃহীত আর্থিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার সংক্রান্ত প্রকল্পগুলি আলোচনা ও এ বিষয়ে সুপারিশ; (৪) প্রকল্পের অগ্রাধিকার নিরূপন; (৫) প্রধান বা অন্য সদস্যের বিরুদ্ধে আনীত নথিভুক্ত অভিযোগগুলির বিবেচনা; (৬) গ্রাম পঞ্চায়েতের

আয়ব্যয়ের হিসাব বিবেচনা; (৭) গ্রাম পঞ্চায়েতের অডিটের প্রতিবেদন বিবেচনা; এবং (৮) সভায় উত্থাপিত সকল বিষয় আলোচনা করে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে প্রেরণ।

পঞ্চায়েত সমিতি সম্পাদনা

"১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন" অনুসারে পঞ্চায়েত সমিতি পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দ্বিতীয় বা মধ্যবর্তী স্তর। এই স্তর সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক স্তরে গঠিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্লকের নামানুসারে প্রত্যেক ব্লকে একটি করে পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে মোট ৩৪১টি ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতি বিদ্যমান। পঞ্চায়েত সমিতিগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের মতোই এক-একটি নিগমবদ্ধ সংস্থা, যার একটি সাধারণ সিল রয়েছে ও যারা মামলা করতে পারে বা যার বিরুদ্ধে মামলা করা যেতে পারে।

- সদস্য – পাঁচ প্রকার সদস্য নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতি গঠিত। এঁরা হলেন (১) ব্লকের অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানগণ (এঁরা পদাধিকার বলে সদস্য); (২) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত অনধিক তিনজন সদস্য; (৩) ব্লক এলাকা থেকে নির্বাচিত সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি নন এমন জেলা পরিষদ সদস্য; (৪) ব্লক এলাকা থেকে নির্বাচিত মন্ত্রী নন এমন লোকসভা বা বিধানসভা সদস্য; এবং (৫) মন্ত্রী নন অথচ ভোটার তালিকায় নাম আছে এমন রাজ্যসভা সদস্য। এঁরা প্রতি পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। তবে সরকারি কর্মচারী বা পঞ্চায়েতের কোনও প্রতিষ্ঠানের কর্মী বা পুরসভায় চাকুরিরত ব্যক্তিরা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হতে পারেন না।
  এছাড়াও মোট জনসংখ্যার অনুপাতে প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতিতে তফশিলি জাতি, উপজাতি ও মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত করা হয়েছে এবং তফশিলি জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষিত আসনের ১/৩ ভাগ আসন তফশিলি জাতি ও উপজাতির মহিলাদের জন্য এবং সর্বমোট আসনের ১/৩ ভাগ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।
- সভাপতি ও সহকারী সভাপতি – পঞ্চায়েত সমিতির প্রথম সভায় নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন সভাপতি ও একজন সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। তাদের দপ্তরের মেয়াদ পাঁচ বছর। তবে সাংসদ, বিধায়ক, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বা জেলা পরিষদের সদস্য এমন পঞ্চায়েত সমিতি সদস্যরা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন না। এছাড়াও সভাপতি ও সহকারী সভাপতির পদগুলি তফশিলি জাতি, উপজাতি ও মহিলা জনসংখ্যার অনুপাতে সংরক্ষিত এবং সংরক্ষিত আসনের ২/৩ অংশ আবার ওই সম্প্রদায়গুলির মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। তাছাড়া সর্বমোট সভাপতি ও সহকারী সভাপতি পদের ১/৩ অংশ আবার মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত।
  সভাপতি বা সহকারী সভাপতি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন অথবা পঞ্চায়েত সমিতির অধিকাংশ সদস্য প্রস্তাব গ্রহণ করে তাদের অপসারিত করতে পারেন। এছাড়াও রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট কারণে তাদের অপসারিত করার ক্ষমতা রাখেন। অপসারণ, পদত্যাগ, মৃত্যু বা অন্য কোনও কারণে তাদের পদ শূন্য হলে পঞ্চায়েত সমিতি নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে অপর কাউকে শূন্যপদে অধিষ্ঠিত করতে পারেন। সেক্ষেত্রে নবনিযুক্ত সভাপতি বা সহকারী সভাপতি তার পূর্বতনের অবশিষ্ট মেয়াদকালের জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।
- পঞ্চায়েত সমিতির সভা – প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার পঞ্চায়েত সমিতির সভা ডাকা হয়। এই সভায় মোট সদস্যসংখ্যার ১/৪ অংশের উপস্থিতি প্রয়োজন। তবে মুলতুবি সভার জন্য কোরামের প্রয়োজন হয় না। সভাপতি বা তার অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাপতি সভা পরিচালনা করেন। সভাইয় উত্থাপিত প্রশ্নগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুসারে মীমাংসিত হয়। এক্ষেত্রেও সমসংখ্যক ভোট পড়লে তবেই সভাপতি ব্যক্তি মীমাংসক ভোটটি দিতে পারেন।

জেলা পরিষদ সম্পাদনা

জেলা পরিষদ পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার তৃতীয় তথা সর্বোচ্চ স্তর। জেলা পরিষদের নামকরণ করা হয় সংশ্লিষ্ট জেলার নামানুসারে। কলকাতা ও দার্জিলিং জেলা বাদে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় জেলা পরিষদ বর্তমান। দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমায় জেলা পরিষদের সমক্ষমতা ও মর্যাদা সম্পন্ন একটি মহকুমা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত। পশ্চিমবঙ্গে সেই কারণে বর্তমানে মোট ২০টি জেলা পরিষদ রয়েছে।

- সদস্য – প্রত্যেক জেলা পরিষদে চার প্রকার সদস্য রয়েছেন। এঁরা হলেন, (১) জেলার অন্তর্গত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি (এঁরা পদাধিকার বলে সদস্য); (২) জেলার প্রত্যেক ব্লক থেকে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত অনধিক তিনজন সদস্য; (৩) জেলা থেকে নির্বাচিত অথচ মন্ত্রী নন এমন লোকসভা ও বিধানসভা সদস্য; এবং জেলার ভোটারতালিকায় নাম আছে অথচ মন্ত্রী নন এমন রাজ্যসভা সদস্য।

  এছাড়া জনসংখ্যার অনুপাতে প্রত্যেক জেলা পরিষদে তফশিলি জাতি, উপজাতি ও মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে। তাছাড়াও তফশিলি জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষিত আসনের ১/৩ ভাগ আসন তফশিলি জাতি ও উপজাতির মহিলাদের জন্য এবং সর্বমোট আসনের ১/৩ ভাগ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকে।
- সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি – পঞ্চায়েতের প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর জেলা পরিষদ সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন সভাধিপতি ও একজন সহকারী সভাধিপতি পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। সাংসদ, বিধায়ক, জেলা পরিষদ সদস্য অথচ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এমন ব্যক্তিরা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন না। গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির মতোই সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির পদে তফসিলি জাতি, উপজাতি ও মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই পদগুলিতে তফশিলি জাতি, উপজাতি ও মহিলা জনসংখ্যার অনুপাতে সংরক্ষিত এবং সংরক্ষিত আসনের ২/৩ অংশ আবার ওই সম্প্রদায়গুলির মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। তাছাড়া সর্বমোট সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি পদের ১/৩ অংশ আবার মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত।

  সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন অথবা রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট কারণে কোনও তাদের অপসারিত করতে পারেন। সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি পদচ্যুত হলে, পদত্যাগ করলে বা মারা গেলে যদি ওই পদদুটি শূন্য হয়, তবে পরিষদ নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে নতুন সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি নির্বাচন করেন এবং তিনি পূর্ববর্তী সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির অবশিষ্ট কার্যকাল পর্যন্ত দপ্তরে অধিষ্ঠিত থাকেন।
- জেলা পরিষদের অধিবেশন – প্রতি তিন মাস অন্তর জেলা পরিষদের অধিবেশন বসে। পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যার ১/৪ অংশ অনুপস্থিত থাকলেই বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারে। এক্ষেত্রেও মুলতুবি বৈঠকের জন্য কোনও কোরামের প্রয়োজন হয় না। সভায় উত্থাপিত সমস্ত সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হয়। উভয় পক্ষের সমসংখ্যক ভোট পড়লে সভাধিপতি নির্ণায়ক বা কাস্টিং ভোট প্রদান করে সমস্যা সমাধান করেন।

কমিটি ব্যবস্থাসম্পাদনা

পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির সঙ্গে জড়িত সদস্যদের সময়ের স্বল্পতা, পঞ্চায়েত প্রশাসনের কাজকর্মের ধারাকে অব্যাহত রাখা, মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ ও গণতন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় কমিটি ব্যবস্থার বিধান রাখা হয়েছে। মুখ্যত পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ স্তরে কমিটি ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি এককভাবে বা যৌথভাবে কমিটি গঠনের অধিকারী হলেও, গ্রাম পঞ্চায়েত ক্ষেত্রে অবশ্য কমিটি ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।

জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতিতে এই সকল উদ্দেশ্য রূপায়ণে মোট দশটি স্থায়ী সমিতি বা স্ট্যান্ডিং কমিটি রয়েছে। তবে প্রয়োজনবোধে রাজ্য সরকারের অনুমতি নিয়ে আরও কমিটি এঁরা গঠন করতে পারেন। বর্তমানে কার্যকর কমিটিগুলি হলঃ (১)অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি; (২)জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি; (৩)পুর্তকার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতি; (৪)কৃষি, সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতি;(৫)শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি; (৬)ক্ষুদ্রশিল্প, ত্রাণ ও জনকল্যাণ স্থায়ী সমিতি; (৭)বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি; (৮)মৎস্য ও প্রাণীসম্পন বিকাশ স্থায়ী সমিতি; (৯)খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতি; এবং (১০)বিদ্যুত ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতি।

পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতিগুলির গঠনপদ্ধতি মোটামুটি একই রকম। এই কমিটিগুলির সদস্যগণ হন –

- সভাধিপতি/সভাপতি এবং সহকারী সভাধিপতি/ সহকারী সভাপতি (পদাধিকার বলে)
- জেলা পরিষদ/পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত ৩ , থেকে ৫ জন সদস্য

- রাজ্য সরকার বা কোনও বিধিবদ্ধ সংস্থা বা নিগমের আধিকারিক বা প্রখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত কয়েকজন ব্যক্তি।

সদস্যদের সকলেই কোনও না কোনও কমিটির সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। তবে সভাধিপতি/সভাপতি ও সহকারী সভাধিপতি/ সহকারী সভাপতি ছাড়া কেউই দুটি (জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে) বা তিনটির (পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে) বেশি কমিটির সদস্য হতে পারেন না। প্রত্যেক সমিতি নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে কর্মাধ্যক্ষ বা চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন। তবে এই নির্বাচনের ব্যাপারে সরকার মনোনীত ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন না। এই পদগুলির ক্ষেত্রেও তফসিলি জাতি, উপজাতি ও মহিলাদের আসন সংরক্ষণের ব্যাপারে অপরাপর পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির নীতিই অনুসৃত হয়। তবে সভাপতি বা সভাধিপতিই নিজ নিজ সংস্থার অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হয়ে থাকেন।

প্রত্যেক কমিটি নিজ নিজ সংস্থাগুলি দ্বারা অর্পিত ক্ষমতার প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদনা করে থাকে। এদের এক্তিয়ার নিয়মানুযায়ী বিধিবদ্ধ এবং এই এক্তিয়ারের কর্মসূচি, প্রকল্প সম্পাদন ও আর্থিক প্রশাসনের জন্য কর্মাধ্যক্ষ দায়ী থাকেন।

প্রত্যেক কমিটিতে একজন সচিব থাকেন। পঞ্চায়েত সমিতিতে পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিক এই পদটি অলংকৃত করেন। অন্যত্র সদস্যদের মধ্যে থেকেই সচিব নির্বাচিত হন। সরকার মনোনীত সদস্যগণ এই পদে যোগ দিতে পারেন না। জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে পরিষদ সচিব সকল স্থায়ী কমিটির সচিব হিসাবে কাজ করেন। এখানে উল্লেখ্য, কর্মাধ্যক্ষ সর্বক্ষণের কর্মী হন। তিনি অন্য কোথাও বেতনভোগী কর্মীরূপে কাজ করতে পারেন না।

এছাড়া দশটি সমিতির কাজকর্মের সমন্বয়ের জটিল দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য একটি সমন্বয় সমিতিও কাজ করে থাকে। এই কমিটির কাজ কতকটা মন্ত্রিসভার ক্যাবিনেটের মতো। এই সমিতিগুলি গঠিত হয় সভাধিপতি/সভাপতি, কর্মাধ্যক্ষগণ এবং পরিষদের কার্যনির্বাহী আধিকারিক ও অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী আধিকারিক/ পঞ্চায়েত সমিতির কার্যনির্বাহী আধিকারিককে নিয়ে। নিজ সংস্থার সচিবগণ জেলা পরিষদ/পঞ্চায়েত সমিত্র সমন্বয় কমিটির সচিব হন। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি/ জেলা পরিষদের সভাধিপতি সমন্বয় কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন।

নির্বাচন ব্যবস্থাসম্পাদনা

সংবিধান অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের সমস্ত নির্বাচন পরিচালনা, তত্ত্বাবধান, নির্দেশদান ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। তবে এই নির্বাচন পঞ্চায়েত আইন অনুসারেই নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। আইন অনুসারে পাঁচ বছর শেষ হবার আগেই এই তিন সংস্থায় নির্বাচন করতে হয়। তাছাড়া কোনও পঞ্চায়েত সংস্থা ভেঙে দিলে ছয় মাসের মধ্যে ভোটের আয়োজন করাও বাধ্যতামূলক।

নির্বাচনের সুবিধার জন্য প্রত্যেক পঞ্চায়েত সংস্থাকে কয়েকটি নির্বাচন ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে। এই এলাকার ভোটদাতারা অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ভোটাররাই। গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটার সংখ্যার নিরিখে কোনও কোনও গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনি এলাকা একাধিক সদস্যবিশিষ্ট। অন্যান্য ক্ষেত্রে অবশ্য এই এলাকা এক সদস্যবিশিষ্টই। প্রত্যেক পঞ্চায়েত সংস্থার মেয়াদ পাঁচ বছরের জন্য। তবে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই রাজ্য সরকার যে-কোনও পঞ্চায়েত সংস্থা ভেঙে দিতে পারেন। এছাড়া কোনও সদস্য পদত্যাগ করলে বা পদচ্যুত হলে বা মারা গেলে তার নির্বাচনি এলাকায় পুনরায় নির্বাচন করা যায়।

কার্যাবলি সম্পাদনা

স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের হাতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্পাদনের জন্য বিবিধ ক্ষমতা ও কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যাবলি সম্পাদনা

গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজগুলি ত্রিবিধ – বাধ্যতামূলক, ন্যস্ত ও ঐচ্ছিক।

- গ্রাম পঞ্চায়েতের বাধ্যতামূলক কাজগুলি মূলর গ্রামোন্নয়ন সংক্রান্ত। এর মধ্যে রয়েছে – পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, পৌর এলাকার সুযোগসুবিধার জন্য বাৎসরিক ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রস্তুতিকরণ, আর্থিক উন্নয়ন ও ন্যায়বিচার সংক্রান্ত প্রকল্পগুলির রূপায়ন, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, জলনিষ্কাশন ব্যবস্থাকরণ, মহামারি প্রতিরোধ, পানীয় জল সরবরাহ, লোকব্যবহার্য পুকুর খনন, রাস্তাঘাট রক্ষণাবেক্ষণ, স্বেচ্ছাসেবক সংগঠিতকরণ, কর ধার্য ও সংগ্রহ, গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিল পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।
- অন্যদিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত ও ঐচ্ছিক কাজগুলি সাধারণ উন্নয়ন ও গ্রাম পুনর্গঠন সংক্রান্ত। রাজ্য সরকারও কিছু কিছু দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির উপর ন্যস্ত করে থাকেন। সেক্ষেত্রে এই কাজগুলির সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরকারই গ্রাম পঞ্চায়েতকে দিয়ে থাকেন। এই কাজগুলি হল, প্রাথমিক, সামাজিক, বৃত্তিমূলক ও বয়স্ক শিক্ষা, মাতৃ ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র, খেয়াঘাট পরিচালনা, সেচ, কৃষি, জ্বালানি, পশু চিকিৎসা, ভূমি সংস্কার, সমবায়, গ্রামীণ গৃহ প্রকল্প ইত্যাদি। তবে এই সকল কাজের গতিপ্রকৃতি দেখে সন্তুষ্ট না হলে সরকার এই কাজগুলি প্রত্যাহার করে নিতে পারেন।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বেচ্ছাধীন কাজগুলি হল – রাস্তার আলোর ব্যবস্থা, বৃক্ষরোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, কূপ খনন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমবায় প্রথার প্রবর্তন, হাট-বাজার স্থাপন, দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প গ্রহণ, গ্রন্থাগার স্থাপন, সাংস্কৃতিক কাজকর্ম, সামাজিক ও শিক্ষাগত ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণির কল্যাণসাধন ইত্যাদি। স্থানীয় জনহিতকর যে-কোনও প্রকল্প গ্রাম পঞ্চায়েত স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে পারে।
- এছাড়াও গৃহনির্মাণ, স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতিকরণ, রাস্তা ও জলপথ রক্ষণাবেক্ষণ, দূষিত জলসরবরাহ নিয়ন্ত্রণ, সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হলে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণের ক্ষমতাও গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে ন্যস্ত রয়েছে।

পঞ্চায়েত সমিতির কার্যাবলিসম্পাদনা

ব্লক তথা পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার উন্নয়ন সাধন ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পঞ্চায়েত সমিতির হাতে বিবিধ ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে।

- পঞ্চায়েত সমিতির প্রাথমিক কাজ সামগ্রিকভাবে সমষ্টির উন্নয়ন ও সমাজের প্রতিটি মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে ব্লক এলাকার জন্য একটি পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং একটি বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করা। কৃষি, কুটির শিল্প, সমবায় আন্দোলন, গ্রামীণ ঋণ, জল সরবরাহ, শিক্ষা, সামাজিক বনসৃজন, নারী ও শিশুর কল্যাণ, লোকহিতকর কাজের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান ইত্যাদি বিষয়েও পঞ্চায়েত সমিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে।
- এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির বাজেট অনুমোদন, একই ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি রচিত পরিকল্পনাগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন, এলাকার রাস্তার দিক পরিবর্তন বা রাস্তা বন্ধ করা, দূষনীয় ও বিপজ্জন ব্যবসা বন্ধ করা, হাট ও বাজারের লাইসেন্স দেওয়া ও গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ তদারক করার ক্ষমতাও পঞ্চায়েত সমিতির হাতে ন্যস্ত। তাছাড়া ব্লকের সামগ্রিক পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের জন্য গঠিত ব্লক পরিকল্পনা কমিটিতে পঞ্চায়েত সমিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

জেলা পরিষদের কার্যাবলি সম্পাদনা

পঞ্চায়েত সমিতির মতো জেলা পরিষদের হাতেও আর্থিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কিছু কিছু দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

- জেলা পরিষদের প্রাথমিক কাজ হল সামগ্রিকভাবে সমষ্টির উন্নয়ন ও সমাজের প্রতিটি মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে জেলার জন্য একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং একটি বাৎসরিক পরিকল্পনা রচনা করা। এছাড়া পঞ্চায়েত সমিতিগুলির বাজেট অনুমোদন, একই জেলার পঞ্চায়েত সমিতিগুলি রচিত পরিকল্পনাগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন, এলাকার ও তাদের কাজকর্ম তদারক করাও জেলা পরিষদের অন্যতম কাজ বলে বিবেচিত হয়।
- জেলা পরিষদের অন্যান্য কাজগুলির মধ্যে প্রধান হল – জল সরবরাহ, সেচ, জনস্বাস্থ্য, হাসপাতাল, সমাজকল্যাণ, শিক্ষা, কৃষি, পশুপালন, শিল্প, সমবায় আন্দোলন, গ্রামীণ ঋণব্যবস্থা প্রভৃতি খাতে পরিকল্পনা ও অর্থসংস্থান এবং গ্রামীণ হাট-বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতকে অনুদান প্রদান, প্রকৌশলগত শিক্ষাপ্রসারে বৃত্তিপ্রদান, ত্রাণ, জল সরবরাহ ও মহামারী প্রতিরোধে অর্থবরাদ্দ করা। এগুলি ছাড়া সরকার প্রদত্ত কাজ ও পরিকল্পনার দায়িত্বও জেলা পরিষদগুলিকে পালন করতে হয়।
- এই সব কাজকর্ম ছাড়াও কিছু সমন্বয় ও পর্যবেক্ষণমূলক কাজও জেলা পরিষদকে করতে হয়। এর মধ্যে আছে পঞ্চায়েত সমিতিগুলি কর্তৃক গৃহীত বা পরিকল্পিত প্রকল্পগুলির সমন্বয়সাধন, পঞ্চায়েত সমিতিগুলির বাজেট পরীক্ষা ও অনুমোদন। এছাড়াও ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কার্যাবলি সম্পর্কে জেলা পরিষদ রাজ্য সরকারকে যথাযথ ও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শদানের অধিকারী।

পঞ্চায়েত প্রশাসন সম্পাদনা

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে ন্যস্ত। এই কাজের জন্য রাজ্য সরকারের অধীনে একটি পঞ্চায়েত বিভাগ এবং পঞ্চায়েত অধিকার প্রতিষ্ঠিত আছে।

- পঞ্চায়েত বিভাগ – পঞ্চায়েত বিভাগ ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর অধীনস্থ একটি বিভাগ। এর প্রধান হলেন সচিব। এই বিভাগের কাজ হল পঞ্চায়েত সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করা।
- পঞ্চায়েত অধিকার – পঞ্চায়েত অধিকার পঞ্চায়েত বিভাগের নীতিগুলি রূপায়িত করে থাকে। এর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক হলেন পঞ্চায়েত অধিকর্তা। তাকে সাহায্য করার জন্য দুজন যুগ্ম-অধিকর্তা, তিনজন সহ-অধিকর্তা এবং অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীরাও রয়েছেন।

এছাড়া পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরের জন্য তিন জন আঞ্চলিক সহ-অধিকর্তা, প্রত্যেক জেলায় একজন জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক বা ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত অফিসার (ডিপিও) এবং পঞ্চায়েতের সর্বনিম্ন যোগসূত্র হিসাবে একজন পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিক (ইওপি) রয়েছেন। ডিপিও গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধান করেন ও তাদের পরামর্শ দেন; ইওপি ব্লক স্তরে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের অধীনে কাজ করেন।

প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ এক-একটি 'আবদ্ধ ইউনিট'। [৭] সেজন্য পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত কর্মচারীদের পদোন্নতির সুযোগ ভিন্ন ভিন্ন রকমের

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন সম্পাদনা

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রশাসনিক ব্যবস্থার শীর্ষে আছেন প্রধান ও উপ-প্রধান। এছাড়া প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে একজন করে সচিব থাকেন যিনি পঞ্চায়েতের দৈনিক কাজকর্ম পরিচালনা করেন। তাকে নিয়োগ করেন পঞ্চায়েত অধিকর্তা। এছাড়া থাকেন একজন কর্মসহায়ক বা জব অ্যাসিস্টেন্স। তাকে নিয়োগ করেন প্রধান। তিনি মূখ্যত প্রকল্প সংক্রান্ত কাজকর্ম দেখাশোনা করেন।

এছাড়া পূর্বে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে যে একজন করে দফাদার ও কয়েকজন চৌকিদার থাকতেন, তাদের বদলে পঞ্চায়েতের সর্বক্ষণের জন্য কর্মী নিয়োগ শুরু হয়েছে। এঁদের নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী'।

এছাড়া প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে এক বা একাধিক কর আদায়কারী বা কালেক্টর আছেন, যাঁরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধার্য করা কর আদায় করে থাকেন। এজন্য তিনি মাসিক ভাতা ও কর আদায়ের পরিমাণের উপর কমিশন পেয়ে থাকেন।

পঞ্চায়েত সমিতি প্রশাসন সম্পাদনা

পঞ্চায়েত সমিতি প্রশাসনের শীর্ষে থাকেন সভাপতি ও সহকারী সভাপতি। এছাড়া প্রত্যেক কর্মাধ্যক্ষের হাতেও কিছু কিছু প্রশাসনিক দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। এঁরা প্রত্যেকেই নির্বাচিত প্রশাসক।

এছাড়া পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিক হিসাবে কাজ করেন সংশ্লিষ্ট সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বা ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার (বিডিও)। পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিক পঞ্চায়েত সমিতি এবং অর্থ কমিটির সচিব। এছাড়া অপরাপর কমিটিগুলিতেও একজন করে সচিব থাকেন। সংশ্লিষ্ট ব্লকের আধিকারিক ও কর্মীবর্গকে পঞ্চায়েত সমিতির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্য সরকার প্রয়োজনে অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মচারী দিয়ে পঞ্চায়েত সমিতিকে সাহায্য করে থাকেন।

জেলা পরিষদ প্রশাসন সম্পাদনা

জেলা পরিষদের নীতিপ্রণয়ন ও কার্যসম্পাদনের জন্য জেলা পরিষদের সভাধিপতি বা তার অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাধিপতি নেতৃত্বে একটি প্রশাসন যন্ত্র কাজ করে। সভাধিপতি পরিষদের আর্থিক ও কার্যনির্বাহী প্রশাসনের সাধারণ দায়িত্বে বহাল থাকেন ও পরিষদের দলিলপত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী থাকেন। পরিষদের কাজকর্ম কয়েকটি কমিটির দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে। এই কমিটিগুলির অধ্যক্ষগণ জেলা পরিষদ প্রশাসনে নির্দিষ্ট দায়িত্ব বহন করে থাকেন।

প্রত্যেক জেলার জেলা-শাসক জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী আধিকারিকের পদে আসীন থাকেন। তাকে সহায়তা করেন একজন অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী আধিকারিক; তিনি অতিরিক্ত জেলা-শাসকের মর্যাদাসম্পন্ন আধিকারিক। এছাড়াও অপর একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক পরিষদের সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। এঁরা সকলেই রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন।

এঁরা ছাড়াও প্রত্যেক জেলা পরিষদে একজন করে জেলা প্রযুক্তিবিদ বা ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, মেডিক্যাল অফিসার, উচ্চপদস্থ কারিগরি কর্মী এবং করণিক ও আরদালি থাকেন। রাজ্য সরকারও কিছু কর্মচারীকে পরিষদে ন্যস্ত করে থাকেন।

তহবিল ও সম্পত্তি সম্পাদনা

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান পঞ্চায়েত আইন, নিয়মাবলি ও সরকারি আদেশনামা অনুসারে হয়ে থাকে। এই সংস্থাগুলির আয়ের উৎস দুভাগে বিভক্ত – অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। অভ্যন্তরীন উৎসগুলির মধ্যে আছে কর (ট্যাক্স), অভিকর (রেট), মাশুল (ফি), উপশুল্ক (টোল), জরিমানা ও এগুলির নিজস্ব লগ্নি ও লাভজনক উদ্যোগ থেকে আয়। বাহ্যিক উৎসের মধ্যে পড়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার, জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক দত্ত অনুদান বা ন্যস্ত অর্থ, সরকার আরোপিত করের অংশ, স্থানান্তরিত রাজস্ব, সরকারি আর্থিক সাহায্য ইত্যাদি।

গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয়সম্পাদনা

গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয়ের উৎস তিন ভাগে বিভক্ত – (১) বাধ্যতামূলকভাবে বসানো কর, মাশুল ইত্যাদি; (২) স্বেচ্ছাধীনক্ষেত্রে বসানো কর, মাশুল ইত্যাদি; এবং (৩) সরকার কর্তৃক হস্তান্তরিত বিষয়।

বাধ্যতামূলক বিষয়গুলিসম্পাদনা

- গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জমি ও বাড়ির মালিক ও দখলকারীর থেকে আদায়ীকৃত কর। জমি বা বাড়ির বার্ষিক মূল্য ১০০০ টাকার মধ্যে হলে ১% হারে ও ১০০০ টাকার বেশি হলে ২% হারে কর বসানো বা সংগ্রহ করা হয়। তবে বার্ষিক ২৫০ টাকা কম মূল্যের বাড়ি বা জমি, জনস্বার্থে ব্যবহৃত বা ধর্মীয় বা শিক্ষাগত বা দাতব্য উদ্দেশ্যে নির্মিত ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত কর বসানোর অধিকারী নয়।
- এলাকার মধ্যে যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর, দান, বন্ধক, ইজারা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ২% হারে শুল্ক; প্রমোদানুষ্ঠান যথা প্রদর্শনী, সিনেমা, নাটক ও খেলাধুলার প্রবেশমূল্যের উপর ১০% হারে অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি বসাতে পারে গ্রাম পঞ্চায়েত।
- এলাকায় গৃহনির্মাণ, গৃহসংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমতি প্রয়োজন। এই অনুমোদনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত নির্দিষ্ট হারে মাশুল আদায় করতে পারে।
- নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত আইন বা বিধি লঙ্ঘিত হলে গ্রাম পঞ্চায়েত জরিমানাও আদায় করতে পারে।

ঐচ্ছিক বিষয়গুলিসম্পাদনা

- রিকশা, ঠেলা, গোরুর গাড়ি ও অন্যান্য পশুবাহিত যানবাহন নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত মাশুল বসাতে পারে। এজন্য এই সকল যানে লাইসেন্স প্রদান করে পঞ্চায়েত। তাছাড়া, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রেও নিবন্ধীকৃত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মাশুল আদায় করতে পারে পঞ্চায়েত।
- দেবস্থান, তীর্থস্থান ও মেলায় জনস্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত মাশুল বসাতে ও আদায় করতে পারে।
- পানীয় জল, সেচের জল বা অন্যান্য উদ্দেশ্যে সরবরাহকৃত জলের উপর অভিকর বা জলকর বসাতে পারে গ্রাম পঞ্চায়েত।
- রাস্তা বা সর্বজনীন স্থানে আলোর ব্যবস্থা করলে পঞ্চায়েত অভিকর বসাতে পারে।
- ব্যক্তিবিশেষের বা জনসাধারণের শৌচাগার ও আবর্জনা ফেলার স্থানের ব্যবস্থা করলে তার উপর গ্রাম পঞ্চায়েত অভিকর বসাতে পারে।
- গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত বা তার ব্যবস্থাধীন খেয়াঘাট ব্যবহারের উপর গ্রাম পঞ্চায়েত উপশুল্ক আদায় করতে পারে।
- কুকুর, পাখি বা অন্যান্য গৃহপালিত জন্তুর উপর গ্রাম পঞ্চায়েত মাশুল বসাতে পারে।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে স্থিত জমিতে পশুচারণের উপর গ্রাম পঞ্চায়েত মাশুল বসাতে পারে।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে স্থিত শ্মশানঘাট ব্যবহারের উপর গ্রাম পঞ্চায়েত মাশুল বসাতে পারে।
- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহৃত মোটরচালিত শ্যালো টিউবওয়েল ব্যবহারের উপর পঞ্চায়েত নিবন্ধীকরণ মাশুল আরোপ করতে পারে।

সরকার কর্তৃক হস্তান্তরিত উৎসসম্পাদনা

গ্রাম পঞ্চায়েতের আয় বৃদ্ধির জন্য এলাকাধীন খোঁয়াড়, সরকারি পুকুর, ডোবা ও দিঘি এবং সকল প্রকার খাস জমি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। এছাড়া পঞ্চায়েতগুলি নিজেরা কোনও উদ্যোগ পরিচালনা করে আয় বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। এই উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার, ব্যাঙ্ক বা অপর কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে পারে তারা।

পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের নিজস্ব আয়সম্পাদনা

পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের নিজস্ব আয়ের উৎসগুলি মোটামুটি একই রকমের। রাজ্য সরকার নির্ধারিত সর্বোচ্চ হারে এরা কর, অভিকর, মাশুল ও উপশুল্ক বসাতে পারে। উভয় সংস্থাই নিজ পরিচালনাধীনে থাকা সড়ক ও সেতুর উপর চলাচলকারী মানুষ, যানবাহন

ও মালিকানাধীন পশুর উপর উপশুল্ক; খেয়াঘাটে উপশুল্ক; যানবাহন নিবন্ধীকরণ, তীর্থ ও মেলায় স্বাস্থ্যসম্পর্কিত ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য, মেলার লাইসেন্স বাবদ মাশুল; জল সরবরাহ, সর্বজনীন স্থানে আলোর উপর অভিকর বসাতে পারে। পঞ্চায়েত সমিতি হাট ও বাজারের লাইসেন্স বাবদ মাশুল ও জেলা পরিষদ নৌকা নিবন্ধীকরণের জন্য মাশুল আদায় করতে পারে। নির্দিষ্ট আইন বা বিধিভঙ্গ করলে এরা জরিমানাও আদায় করতে পারে। তবে একটি বিষয়ের উপর একটি পঞ্চায়েত সংস্থাই কর বা মাশুল ধার্য করতে পারে।

এছাড়াও জেলা পরিষদের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস হল পূর্ত ও সড়ক উপকর। এই কর রাজ্য সরকার নির্ধারিত হারে জেলা পরিষদ আদায় করে ও তারাই ভোগ করে। এছাড়াও জেলা পরিষদের হাতে রাজ্য সরকার দ্বারা ন্যস্ত ডাক-বাংলো, হাসপাতাল, খাস জমি ও পুকুর-দিঘি থেকে প্রাপ্ত আয়ও পরিষদের আয়ের অন্যতম উৎস।

এছাড়াও পরিষদ নিজ উদ্যোগে আয় বাড়াতে পারে বা সরকার, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থা থেকে ঋণ তুলতে পারে।

<u>সরকারি অনুদান সম্পাদনা</u>

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির আয়ের উৎস যথেষ্ট নয়। সেই কারণে এদের সরকারি অনুদানের উপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়। এই সরকারি অনুদানই গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের আয়ের প্রধান উৎস। এই অনুদান প্রধানত দুই ধরনের – সাধারণ অনুদান ও বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প রূপায়নে বরাদ্দ বিভাগীয় অর্থ।

গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি কর্মচারী, প্রধান ও উপ-প্রধানের বেতন, সদস্যদের রাহাখরচ ও দৈনিক ভাতা বাবদ সরকারি অনুদান; ম্যাচিং গ্রান্ট ও প্রকল্প রূপায়নের জন্য বরাদ্দ অর্থ পেয়ে থাকে।

পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকেও রাজ্য সরকার বিভিন খাতে অনুদান ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বাবদ অর্থ; প্রশাসনিক ব্যয়বরাদ্দ ও প্রকল্প রূপায়নের অর্থ দিয়ে থাকে।

জেলা পরিষদ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অনুদান পেয়ে থাকে। এই অনুদানে কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান; প্রশাসনিক ব্যয় ও প্রকল্প রূপায়নের ব্যয় নির্বাহিত হয়। ১৯৯৫ সালে গঠিত অর্থ কমিশনের প্রতিবেদন অনুসারে প্রমোদ কর থেকে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ; অন্যান্য সব রকমের সংগৃহীত কর থেকে ১৬% রাজ্য সরকার স্থানীয় পঞ্চায়েত সংস্থা ও পুরসভাগুলিকে দিয়ে থাকেন এবং সেচ কর বাবদ আদায়ীকৃত অর্থ জেলা পরিষদকে দিয়ে থাকেন।

নিরীক্ষা বা অডিটসম্পাদনা

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন অনুসারে পঞ্চায়েত সংস্থাগুলি আয়ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির আয়ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব সরকারি সংস্থা একজামিনার অব লোকাল অ্যাকাউন্টস দ্বারা নিরীক্ষিত হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে এই কাজ করেন পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিক।

পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির নিরীক্ষক সংস্থার কর্মচারীরা হলেন –

- গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড অডিট অফিসার;
- পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে জেলা স্তরে সমিতি অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড অডিট অফিসার;
- জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে জেলা স্তরে পরিষদ অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড অডিট অফিসার।

এঁদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য প্রত্যেক বিভাগীয় কমিশনারের অধীনে একজন করে রিজিওনাল অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড অডিট অফিসার আছেন। রাজ্য স্তরে পঞ্চায়েত ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের অধীনে একজন বিশেষ আধিকারিকও আছেন। এঁদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি পঞ্চায়েত আইন অনুসারে বিধিবদ্ধ।

আয়ব্যয় নিরীক্ষার ক্ষেত্রে এরা চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। দুর্নীতিরোধে এদের হাতে বিশেষ দায়িত্ব ও ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি আইনবিরুদ্ধভাবে অর্থব্যয় করলে সংস্থার কোনও সদস্যকে অপসারিতও করা যাবে।

অডিট রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট সংস্থার অধিবেশনে আলোচিত হয়ে থাকে। এই রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছেও জমা করতে হয়।

এছাড়াও দুর্নীতিরোধে জেলা পরিষদের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। জেলা বা মহকুমা পরিষদে বিরোধী দলনেতা এই কাউন্সিলের অধ্যক্ষ হয়ে থাকেন।

পঞ্চায়েত ও বিকেন্দ্রীকরণ সম্পাদনা

ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই সুবৃহৎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সেই কারণে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এছাড়াও এই ব্যবস্থা ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর পক্ষে আদর্শগতভাবেও অত্যন্ত জরুরি।

পঞ্চায়েত ভারত অথা পশ্চিমবঙ্গে দায়িত্বশীল স্থানীয় সরকারের কাজ সম্পাদনা করে থাকে। এরা অবশ্যই সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হয় না; নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যেই কার্যকরী স্বাধিকার বা ফাংশনাল অটোনমি হিসাবে কাজ করে থাকে। এই উপায়ে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, নাগরিকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দাবিগুলির নিরূপণ সম্ভব। স্থানীয় সমস্যার সমাধান যা কেন্দ্র বা রাজ্য রাজধানী থেকে করা সম্ভব নয় – তার সমাধানও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমেই সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব।

গ্রামোন্নয়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকাসম্পাদনা

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রামোন্নয়ন সংক্রান্ত সব কর্মসূচির সঙ্গেই পঞ্চায়েত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত। গ্রামোন্নয়নে পঞ্চায়েতের কাজগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে –

- আর্থ-সামাজিক কাঠামোগত উন্নয়ন (যেমন সড়ক, কার্লভার্ট, প্রাথমিক বিদ্যালয়, গৃহনির্মাণ ও সংস্কার ইত্যাদি)।
- মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তন (যেমন ভূমি সংস্কার, উদ্বৃত্ত জমি বন্টন, বর্গাদার রেকর্ড ও ঋণের ব্যবস্থা)।
- কেন্দ্র, রাজ্য সরকার ও স্বগৃহীত বিভিন্ন মানবসম্পদ উন্নয়নগত পরিকল্পনা রূপায়ন।
- বিশেষ এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা (যেমন দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চল উন্নয়ন কর্মসূচি)।
- সম্পদ সংগ্রহ (যেমন খেয়াঘাট ও হাটবাজার পরিকল্পনা ও ন্যস্ত পুকুরগুলিতে মৎসচাষ করে সম্পদ সংগ্রহ করা)

**তথ্যসূত্রঃ উইকিপিডিয়া